ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের উৎসে কোনো কর দিতে হবে না: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের ওপর কোনো উৎসে কর দিতে হবে না। তথ্যটি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে ফেলিসিটি ইন্টারনেট ডাটা সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত ‘বিএফএসআই ক্লাউড এবং সাইবার সিকিউরিটি’ শীর্ষক নলেজ শেয়ারিং অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের আশ্বস্ত করে বলেন, তাদেরকে কোনো উৎসে কর দিতে হবে না। তারা ট্যাক্সের আওতার বাইরে।

গত কয়েকদিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছিলো যে, দেশের ফ্রিল্যান্সারদের বৈদেশিক আয়ের ওপর ১০% কর দিতে হবে। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য আসতে শুরু করে। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বিভিন্ন মহলে গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে, ফ্রিল্যান্সারদের কর দিতে হবে। এটা করে একটি চক্র বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘গত ১৪ বছরে প্রযুক্তিবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের উন্নয়ন ও বিকাশে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে অনুদান প্রদান, তাদের আইডিসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।’

বিভ্রান্তিটি তৈরি করা হয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত ‘আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১২৪ ধারা (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52Q) অনুযায়ী সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের উপর উৎসে কর কর্তন ও জমাদান প্রসঙ্গে’ ইস্যুকৃত একটি প্রজ্ঞাপন থেকে। তাতে বলা হয়, নতুন আয়কর আইন অনুসারে সকল উৎসকর নির্ধারিত কোডের অনুকূলে জমা দিতে হবে। এই প্রজ্ঞাপনে কোথাও ফ্রিল্যান্সারদের ১০% উৎসকর

দেওয়ার কথা বলা নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই প্রজ্ঞাপনের সংযুক্তি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর অঞ্চল-১১ এর ১২ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে ফি, সেবা চার্জ বা পারিশ্রমিক বা প্রকৃতির রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ কোনো ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপকের হিসাবে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের ওপর ১০% হারে কর কর্তন করার কথা উল্লেখ থাকায় এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিদেশ থেকে অর্জিত অর্থে কর আছে বটে, তবে তা ফ্রিল্যান্সারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর পরিদর্শক শাদনান মাহমুদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনটি একদমই রুটিন প্রজ্ঞাপন। প্রজ্ঞাপনের কারণ হল সেবা খাত, রেভিনিউ শেয়ারিং খাত এইসব খাত থেকে বিদেশ থেকে যে আয় আসে, সেই আয়ের উপর যে কর তা আগে বিভিন্ন কর অঞ্চলে জমা দিতে হতো। নতুন আয়কর আইন আসার পর সরকার নিয়ম করেছে যে, এই খাতের কর বিভিন্ন কর অঞ্চলে জমা না দিয়ে মাত্র একটা কর অঞ্চলের কোডে জমা দেয়া লাগবে। ওই কর অঞ্চল ঢাকা-১১ সেটিই একটা চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে মনে করিয়ে দিয়েছে। এর বেশি আর কোন কথা চিঠিতেও লেখা নেই।।

২০১৮ সালে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর সংশোধন করে ফ্রিল্যান্সারদের ওপর কর প্রত্যাহার করা হয়। আয়কর আইনে ফ্রিল্যান্সারদের কর দেওয়ার বিষয়টি বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

করোনা ভাইরাস সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারিতে প্রতিটি দেশের অর্থনীতি ও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সাথে সৃষ্টি হয়েছিল ভয়, সংক্রমণ ও

মৃত্যুর সুদীর্ঘ তালিকা। দুই বছরের মত মানুষ ছিল ঘরের মধ্যে বন্দি। ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে আরও ভয়াবহ ও দীর্ঘ হয়েছিল প্রতিটি দিন প্রতিটি ক্ষণ।

যখন বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ উন্নত বিশ্বে আবিস্কৃত প্রতিষেধক তাদের নিজেদেরকে সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কিনতে ও ব্যবহার করতে পারছে না। তখন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বলিষ্ট ভূমিকা রেখে (আবিস্কৃত টিকার মেধাস্বত্ববিহীন করার প্রস্তাব দিয়ে অনুমোদন করিয়ে) সেই বৈশ্বিক মহামারি থেকে বাংলাদেশের মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন দেশের আটটি ভ্যাক্সিন।

যেখানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে বাংলাদেশে। সেই টিকা কিনে বিনা মূল্যে প্রয়োগ করে নিরাপদ স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করেছিলেন এবং বাঁচিয়েছিলেন লক্ষ মানুষকে প্রাণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা দিয়ে অর্থনীতিকে করেছিলেন সচল। তিনি স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জাতীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করেছিলেন এবং সেইসাথে অধিদপ্তর ভিত্তিক কিছু কমিটিও গঠিত হয়, যেখানে বিশেষজ্ঞ সদস্যরা সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে নিশ্চিত করেছিলেন মানুষের জীবনের সুরক্ষা। বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে সৃষ্টি করেছিল জনসচেতনতা।

তাঁর নির্দেশে তৈরি জাতীয় পরামর্শ কমিটি ও অধিদপ্তর ভিত্তিক কমিটিগুলো মহামারির শুরুতেই কোভিড রোগী সনাক্তকরণে ব্যবহৃত কিট, পিপিই, অক্সিজেন ও মেশিনপত্র আমদানিতে শুক্ল মওকুফ করে মানুষের ব্যবহারের সুবিধা করে দিয়েছিল। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে আমদানি অনুমোদন, তৈরি, সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করেছে সেই সময়ের জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় ওষুধসমূহের। যার ফলে স্বল্প ব্যয়ে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সকল কোভিড রোগী সনাক্ত করা, আইসোলেশনে রাখা ও চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রয়োজন অনুযায়ী কোভিড-১৯ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করতে নতুন নতুন বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ প্রক্রিয়ায় নতুন চিিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। জটিল রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ শয্যার

ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছিলেন। কোভিড রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমদানিও করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, হাসপাতালে করোনা রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা যাতে ব্যঘাত না ঘটে সেজন্য চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ রাখতে তাদেরকে হোটেলে রেখে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে যে অবদান রেখেছিলেন তার সুফল পেয়েছিল বাংলাদেশ। অর্থনীতিকে রাখতে পেরেছিলেন সচল। তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্ব ও সর্বক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মনোভাব সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন আস্থার ও ভরষার আশ্রয়স্থল।

লেখক: ডিন, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

এইতো এক যুগেরও আগের কথা, উন্নয়নের তলানিতে ডুবে ছিলো এই দেশ। লুটতরাজ ও দুর্নীতিবাজরা দেশে দুঃশাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশকে পিছিয়ে নিতে তৎপর ছিলো। চেয়েছিলো অবৈধ পথে ক্ষমতায় বসতে কিন্তু ২০০৯ সালে জনগনের ভোটের রায়ে অশুভ শক্তির সকল অপচেষ্টা বিফলে যায়। সফল রাষ্ট্রনায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২য় মেয়াদে এই দেশের মানুষ অভিভাবকের আসনে বসান। সেই থেকে রচিত হতে থাকে উন্নয়নের মহাকাব্য।

সুপরিকল্পিতভাবে দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে থাকেন তিনি। গ্রাম থেকে শহর বাংলাদেশের সকল স্থানে উন্নয়নের ছোয়া লাগা শুরু হয়। দেশের মানুষকে এখন আর আদিম যুগের মতো পরনির্ভরশীল থাকতে হয় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদেরকে

আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করেছে, প্রযুক্তি হয়েছে সহজলভ্য।

সকল উন্নয়ন ও প্রযুক্তির বিস্তারের পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের। ইতিমধ্যে এর সফল বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। সরকারের সদিচ্ছার ন্যায় দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ আমাদের সবার। দেশ স্মার্ট হলে এ জাতি স্মার্ট হবে। তাই সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগীতা করতে হবে সকলের।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমাদের সকলের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার চারটি ভিত্তি রয়েছে। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হলে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

‘স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। এককথায় সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এক শিক্ষার্থী, এক ল্যাপটপ, এক স্বপ্নের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ এর নয়টি কার্যপরিধিও সুস্পষ্ট করেছে সরকার যথা- ১. অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান; ২। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৩. স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক

পরিমন্ডলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিধি-বিধান প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৪. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৫. এজেন্সি ফর নলেজ অন এরানোটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৬. ব্লেন্ডেড এডুকেশন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ফাইভজি সেবা চালু পরবর্তী সময়ে ব্যান্ডউইথের চাহিদা বিবেচনায় চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৭. রপ্তানি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মেড ইন বাংলাদেশ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৮. আর্থিক খাতের ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং ৯. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ (স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গর্ভমেন্ট) বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান।

স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর করবে আওয়ামী লীগ সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হবে। সুতারং সরকার আগামী ২০৪১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আদর্শগত এমন রূপান্তর ঘটাবে যেখানে সকল সেবার ভিড়ে না হারিয়ে নাগরিকগণ নিজের প্রয়োজনীয় সেবা সহজে খুঁজে পাবেন; সেবা গ্রহিতার দায় নয় সেবা প্রদানকারীর দায়কে শক্তভাবে দেখা হবে; সরবরাহ কেন্দ্রিক থেকে চাহিদা কেন্দ্রিক সার্ভিসের যোগান হবে; নাগরিকগণকে এখন ডিজিটাল মাধ্যমেও নানান চ্যানেলে (অ্যাপ, ওয়েব, কল সেন্টার ইত্যাদি নানা প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে হয়) সেবা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশে একটি মাত্র প্লাটফর্ম থেকে নাগরিকগণ সকল চাহিত সেবা পাবেন। নানান পরিচয় নম্বরের (যেমন এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন নম্বর ইত্যাদি) পরিবর্তে একটি পরিচয় নম্বর (ইউনিক আইডি) দিয়ে সকল কার্যক্রম সম্পাদন এবং সরকারি সেবা প্রদানকে দেখা হবে সেবা গ্রহিতার চোখে, সেবা দাতার চোখে নয়।

এক সময় টাকা নগদ তুলে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে জমা করতে হতো। কারণ, এক ব্যাংকের চেক অন্য ব্যাংক গ্রহণ করত না। পরে চেক

গ্রহণ করলেও সেই টাকা জমা হতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগে যেত। আবার এক ব্যাংক থেকে বস্তা ভর্তি টাকা তুলে অন্য ব্যাংকে জমা করতেও দেখা যেত। অন্য কারও হিসাবে বা কাউকে টাকা পাঠাতে ব্যাংকে লাইন পড়ে যেত। আবার টাকা পাঠানোর জন্য কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসাও ছিল জমজমাট। কেনাকাটা ও লেনদেনের পুরোটাই হতো নগদ টাকায়। পরিসেবা বিল পরিশোধের জন্য ব্যাংকগুলোতে লাইন লেগে থাকত। মোবাইলে টাকা রিচার্জ করতেও প্রতিটি বাজার ও মহল্লায় ছিল একাধিক দোকান। নতুন প্রজন্মের কাছে এসব সাজানো গল্প মনে হতে পারে। তবে বাস্তবতা হলো আর্থিক লেনদেনে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এসব এখন অনেক কিছুই ইতিহাসের অংশ।

ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডে কেনাকাটা, মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস), ইন্টারনেট ব্যাংকিং, অ্যাপসে লেনদেন, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্টসহ এমন নানামুখী ডিজিটাল লেনদেন জীবনে এনে দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নগদ টাকা বহনের ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে। জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। আর প্রতিটি লেনদেনে থাকছে ডিজিটাল রেকর্ড। যা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যাচ্ছে। এখন কার্ডের পরিবর্তে অ্যাপস,কিউআর কোড ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। মুঠোফোনই হয়ে উঠছে লেনদেনের বড় মাধ্যম। ব্যাংকগুলোর ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায়,মাই ক্যাশ,ট্যাপের মতো এমএফএসের কারণে সাধারণ মানুষ ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

স্মার্ট ইকোনমির অংশ হিসেবে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রবাস যাত্রা সহজ করতে এবং প্রবাসে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক কাগজপত্র ও সেবাসমূহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট থেকে প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে প্রবাসী হেল্প ডেস্ক চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এটুআই চালু করেছে ‘সাথী’ নামক একটি নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহযোগিতায় এটুআই প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তা নিয়ে এই নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু করেছে। দেশের সকল পরিষেবা বিল, শিক্ষা সংক্রান্ত ফি ও অন্যান্য সকল ধরনের সরকারি সেবার বিল প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিতকরণে চালু হওয়া সমন্বিত পেমেন্ট প্ল্যাটফরম ‘একপে’-তে বিভিন্ন ধরনের করতে নতুন ৮টি আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নতুন পেমেন্ট চ্যানেল যুক্তকরণ।

সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

লেখক:কোষাধ্যক্ষ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি পেতে আদালতে যাওয়ার সরকারি পরামর্শকে শুরুতে আমলেই নেয়নি বিএনপি। দলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা বলেন, খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত রেখে যেভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সেভাবেই তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে সরকার। ফলে তারা আদালতে আবেদন নিয়ে যাবেন না। তবে খালেদার চিকিৎসার জন্য বিএনপি আবেদন না জানালেও ঠিকই তার পরিবার এগিয়ে এসেছে।

খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে পাঠাতে সরকারের কাছে আবারও চিঠি দিয়েছেন তার ভাই শামীম ইস্কান্দার। তাদের একবার আবেদন দেওয়া আরেকবার না দিতে চাওয়া উদ্দেশ্যমূলক উল্লেখ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কেউ যদি তার স্বজনের আসলেই ভালো চান, তাহলে যেকোন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবেন না। আদালতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিএনপি আসলে তাদের নেত্রীর অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠাতে সরকারের কাছে আবারও চিঠি দিয়েছেন তার ভাই শামীম ইস্কান্দার। তিনি বলেন, ‘বাইরে পাঠানোর জন্য দুই-তিন দিন আগে শামীম ইস্কান্দার সাহেব এসেছিলেন। ওইদিনই বলে দিয়েছি। আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন। আইনি জটিলতার কারণে চিঠিটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। উনি (আইনমন্ত্রী) এখন ব্যাখ্যা দেবেন।’

এর আগে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তাকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে গিয়েছিলেন তার ভাই-বোনসহ পরিবারের সদস্যরা। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ২০২০ সালের এপ্রিলে এ ঘটনাটিকে সামনে এনে জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে খালেদা জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার, বোন সেলিমা ইসলাম, বোনের স্বামী রফিকুল ইসলাম দেখা করে মুক্তির আবেদন করেন। তখনও বিএনপি নেতারা দলটির পক্ষ থেকে চেয়ারপারসেন চিকিৎসার জন্য আইনগত কোনো পদক্ষেপও নেয়নি।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গত ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে মানবিক আবেদন করতে হলে প্রথমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করতে হবে। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়ে মতামত চাইতে পারে। খালেদা জিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তিনি আজকে মুক্ত ও এভারকেয়ার হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পাচ্ছেন। সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে পাচ্ছেন। তারপরও তারা আবেদন করলে দেখা যাবে।’

তখন বিএনপি থেকে জানানো হয়, বেগম জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার আবেদন করেছিলেন। ফলে তাদের আর নতুন করে আবেদনের দরকার নেই। এরপরই ২৫ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ‘ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১)-এর ধারার ক্ষমতাবলে শর্তযুক্তভাবে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত রেখে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায়।’

৪৭টি মোবাইল ও ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে বিভিন্নভাবে হারিয়ে যাওয়া ৪৭ টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণা করে নেওয়া ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিলো পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার সময় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে মালিকদের কাছে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৭ টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া ৯ ব্যক্তির মোট ৯৭ হাজার টাকা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্বার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। এসব প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উদ্ধার কৃত মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ১৬টি, গাংনী থানার ১১টি ও মুজিবনগর থানার ২০টি ফোন রয়েছে। এ ছাড়া মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার আওতায় হওয়া মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদেও মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) কামরুল ইসলাম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর কেউ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না

বাংলাদেশের নির্বাচন ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ করার লক্ষ্যে কেউ যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির আওতায় ফেলেছে বাংলাদেশকে। যদি এমন কেউ ভিসার জন্য আবেদন করে যিনি বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্থ করতে চায় বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি ভিসা নাও পেতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভালোর জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে একথা না বলে উপায় থাকে না যে- যুক্তরাষ্ট্র অন্যদেশের স্বার্থ

সংরক্ষণ করে এমন আমার জানা নেই। তারা যেকোন সিদ্ধান্ত নেয় নিজের স্বার্থ রক্ষায়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের অন্যতম একটি অস্ত্র হলো ‘স্যাংশন’। যেকোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন দেশকে শাস্তি দিতে হলে, বা যুক্তরাষ্ট্র কাউকে শাস্তি দেবে মনে করলে তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন হলো, এইটা কোন রাষ্ট্র কখন পারে? বা আদৌ তারা কীভাবে পারে? একক কোন দেশ, অন্য কোন সার্বভৌম দেশের ওপর স্যাংশন দেয়া আইনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে। তথাকথিত চিন্তা হলো- বিশ্বের সব দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে একটি সংস্থা কাজ করে। সেটি হলো জাতিসংঘ। তাকে পাশ কাটিয়ে কোন একটা দেশ অপর দেশের ওপর যখন তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়, তখন সে তার অস্ত্র হিসেবে স্যাংশনকে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র যখন সেই সিদ্ধান্ত নিতে চায় তখন সে খেয়াল করে ওই দেশের সঙ্গে মেজরিটি কান্ট্রি আছে কিনা? সেসব বিচার করে আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি মনে করি, বর্তমানে স্যংশনের নামে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে জনগনকে শাস্তি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আপনি স্যাংশন আরোপের কথা বলছেন বা বাস্তবায়ন করছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটা যখন করছেন তখন এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কস্ট দেওয়া হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের মানুষের কস্টে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আর এই দেশের মানুষের এও জানা আছে যে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো তা আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমেরিকা আসলে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরী করলো? এবার একটু পিছনের দিকে ফিরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে তারা বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি। শুধু তাই নয়, একটি যুদ্ধোত্তর দেশকে সামনে এগোতে নানা বাধা সৃষ্টি করেছিল। নিজের স্বাধীন দেশের জন্যে, বঙ্গবন্ধু যখন কিউবাতে গিয়ে তাঁর চটের বস্তা নিয়ে কাজ করতে চাইলেন তখন আমেরিকা বাধ সেধেছিলো। সেসময় তারা খাদ্য অনুদান দিতো, সেটি বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশে চরম খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় খাদ্য সংকটে পড়েছিলো এই দেশ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। লেখার শুরুতে যেটা বলছিলাম, আসলে শাস্তিটা পায় সাধারণ মানুষ।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভেনেজুয়েলাতে তাদের স্যাংশনের কারণে ৪০ হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রর একক সিদ্ধান্তে মারা গেলো ৪০ হাজার শিশু! এমন পরিস্থিতি যখন শুধু একটি দেশের ইচ্ছায় হয়, তখন কোন সম্মিলিত বিশ্বব্যবস্থা তা মানতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে এই স্যাংশন অস্ত্র যেভাবে কাজে লাগাতে চাইছে, সেটা আগামীদিনে কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে আমার শঙ্কা রয়েছে। কারণ স্যাংশনে পড়া অনেক দেশ সেটা ভেঙে ফেলতে চাইছে। যেমন ধরা যাক, ইউক্রেনের জন্য রাশিয়াকে যে স্যংশন তারা দিয়েছে, তা কি রাশিয়া মানছে? কিংবা ধরা যাক, উগান্ডা কিংবা নাইজেরিয়ার কথা।

ঠিক একইভাবে, বাংলাদেশে তারা এখন অবাধ সুস্ঠু নির্বাচনের কারণ দেখিয়ে স্যংশনের হুমকি দিল। প্রশ্ন হলো, তারা ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের কথা বলছে বটে, কিন্তু অবাধ পরিবেশ তৈরী করছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে, যারা আমেরিকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের বশে আনার উপায় হিসেবে স্যাংশন দিচ্ছে। তারা কার ওপর হুমকি দেবে, সেটা নিশ্চিত বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেকের ভিসাও যে আমেরিকা দেয়নি সেই উদাহরণও আছে।

আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হলো, কারা কী করছে যুক্তরাষ্ট্র কোথা থেকে সে তথ্য নিচ্ছে? সেই তথ্য একপেশে, না গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনা কে করবে? একজন তথাকথিত মানবাধিকারকর্মী আদিদুলের আইনের পথে বিচার হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথা ব্যাথার কারণ হয় এবং তার পক্ষে সরব অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই লোক যে ৬১ লাশের কথা বলে মিথ্যাচার করলো এবং সেই মিথ্যাচার যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরী করলো, অরাজকতার চেষ্টা হলো, সেটা উল্লেখ না করে, বিবেচনায় না নিয়ে, প্রকারন্তরে সমর্থন দিলো! সেই বিষয়টা অন্ধকারে রেখেই কী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন হবে?

আসলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছে যে এই স্যাংশন নিয়ে রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ভাল আছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত যে অর্থব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে এধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, মার্কিনবিরোধী জোট তৈরীতে সহায়ক হবে। এই বোধ আমেরিকার থাকতে হবে। যদিও এ নিয়ে আমি তাদের উপদেশ দিতে চাই না। শুধু বলতে চাই, একপেশে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার জন্য স্যাংশনের মত কোন উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য না। বাংলাদেশের জন্যে ভিসানীতি ঘোষণার পর দেখা গেছে, একপক্ষ আনন্দ নিয়ে উগ্রীব হয়ে আছে। এতেই বোঝা যায় এটি একটি রাজনীতি বিভাজন প্রক্রিয়া। যে কারণে এক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জেনে খুশি হয়ে যাচ্ছে অন্যপক্ষ।

সেটা কি অবাধ নিরপেক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়ক? এই পরিস্থিতি সংঘাতের কারণ হতে পারে। সেই দায় কে নেবে? ভুলে গেলে চলবে না যে, আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কারণে কোন সংঘাত হলে, এর দায় তাদের নিতে হবে। স্যাংশন বিষয়ে ঘোষণা আসার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আবার সুনির্দিষ্ট করে বলছেন, এরমধ্যে গণমাধ্যমও পড়বে। আবার এরপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, গণমাধ্যম পড়বে এমনটা এখনও না। এ ধরনের আলাপ তোলা, কোন রাষ্ট্রদূতের জন্যে কতটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার? এই প্রশ্ন আমরা এখন তুলতেই পারি। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার বিদেশি রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু তারপরেও তারা এটা করছে, কেনো? এক কথায় এর জবাব হতে পারে, তারা এটা করছে শক্তি দেখানোর জন্যে।
তাদের শক্তি দেখানোর আরও একটি উদাহরণ আছে। সেটা হচ্ছে, পিটার হাস আরও বলেছেন, তারা

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ পযবেক্ষণ করবে। কী অদ্ভুত! তারা কি জানে না, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন? আপনি বিচারককে কীভাবে পযবেক্ষণ করবেন? তিনিতো কাজ করেন আইনের বিধিতে। বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানে। আমেরিকার নিয়মে তো চলবে না। পর্যবেক্ষণের মতো বিষয়গুলো সামনে এনে এরা এসব প্রতিষ্ঠানে রিতীমত বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরী করতে চাচ্ছে।

এখন আমাদের অবস্থান কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সে অনুযায়ী অ্যাক্ট করা দরকার। সত্যিকথা বলতে, আমেরিকা মনে করে ভারত মহাসাগরে তার অবস্থান শক্ত করতে হলে বাংলাদেশকে তার লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী সে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কথা বলে। এখন সেটা ভাঙতে চাইলে বাংলাদেশকে নানারকম চাপ দেয়ার বিকল্প নেই। এখন এই অবস্থা বিবেচনা করে করণীয় ঠিক করাটা বাংলাদেশের জন্যে জরুরি।
লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

কক্সবাজার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টেন্ট (সিএসসি) এর মধ্যে “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। এই প্রকল্পে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টেন্ট (সিএসসি) এর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে সেলট্রন ইএমএস এবং এহসান খান আর্কিটেক্টস।

মঙ্গলবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কউক-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর মোহাম্মাদ নুরুল আবছার, এনজিপি এনডিসি, পিএসসি, বিএন (অব.), লে. কর্নেল মো. খিজির খান পি ইঞ্জ, সদস্য (প্রকৌশল) লে. কর্নেল তাহসিন বিন আলম, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স এবং উপ নগর পরিকল্পনাবিদ ও “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. তানভীর হাসান রেজাউল। এছাড়া সিএসসি-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিএসসি-এর ডিরেক্টর (প্ল্যানিং এন্ড কনস্ট্রাকশন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ-আল-মামুন ও “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল সাদেক মাহমুদ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলা (চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ) এবং সমুদ্র সৈকত এলাকাসহ মোট ৬৯০.৬৭ বর্গ কি.মি. এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এবং কক্সবাজার জেলার ২৪৯১.৮৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া টেকসই যাতায়াত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পাহাড়, বন,

জলাশয় ও সমুদ্র অঞ্চল সংরক্ষণ, সমুদ্র সৈকতের নির্দিষ্ট সীমানা সংরক্ষণ, অবৈধ ও অপরিকল্পিত স্থাপনা অপসারণ, জল ও স্থলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দূষণ প্রতিরোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আবাসন ব্যবস্থা বিষয়ক পরিকল্পনা, সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যবর্ধন ও ভূমিক্ষয় রোধকরণ করা হবে।

প্রকল্পটি ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর মোট ১৭৪.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন দেয়। গত ১২ জানুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

মেহেরপুরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘদিন ধরে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় এবার কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও সংবাদ সম্মেলন করে তাদের দাবি ও পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল ক্যাডারের জন্য সুপার নিউমারি পদে পদোন্নতি দিয়ে ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা দিলেও তা পালিত হয়নি, আন্ত ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা বারবার দেওয়া হলেও সে নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। শিক্ষা ক্যাডারের গ্রেড উন্নয়নের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও কার্যকর করা হয়নি।

তিনি দাবী জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকালকে নন ভেকেশন সার্ভিস ঘোষণা কেও পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বলেন, এসকল দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্দেশনা অনুযায়ী ২ অক্টোবর সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এক দিনের কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এই কর্ম বিরতি শুধুমাত্র সরকারি কলেজগুলোতে পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলী মালিথা, সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সরকারী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন, নজির আহমেদ সিদ্দিকী সহ শিক্ষক নেতারা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা কোন দেশকেই দমাতে পারেনি, বাংলাদেশকে পারবে?

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গত সাড়ে তিন দশক ধরে পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক থেকে শুরু করে সিরিয়া, হালের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেও বাতাস দিচ্ছে তারা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই থাবা থেকে বাদ যায়নি আফ্রিকার দেশগুলোও। যখন যেখানে নিজেদের স্বার্থের বিষয় এসেছে, সেখানেই যুক্তরাষ্ট্র নানান কৌশল আর ছলচাতুরি আশ্রয়ে হস্তক্ষেপ করেছে।

জারি করেছে নানা ধরণের স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস আগে জারি করলো ভিসা নীতি। বিশ্বের বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, এটা তারা করেছে নিজেদের স্বার্থে এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তেক্ষেপ করলো। গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা আর সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক ভোটের অজুহাত দিয়ে, বাংলাদেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করলো যুক্তরাষ্ট্র। এর পেছনের গল্প হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভাল নয়। তাই তাদের লক্ষ্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করা।

বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শেষ দু’টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠছে। এখন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নানাভাবে ঘায়েল করছে তৎপর বাইডেন প্রশাসন। নিজেদের দেশের এসব অগণতান্ত্রিক আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। উল্টো নিজের মোড়লিপনা জাহির করে সেসব অপকর্ম ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করছে।

একটু পিছনের দিকে গেলে দেখা যায়, আজকে যে স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞার সংস্কৃতি চালু হয়েছে, এর শুরু হয়েছিল নব্বই এর দশকে এই যুক্তরাষ্ট্রের হাত ধরেই। বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই ‘স্যাংশন পলিটিক্স’ এখন ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জর্জ লোপেজ যুক্তরাষ্ট্রের এই স্যাংশন পলিটিক্সকে নব্বইয়ের দশককে ‘স্যাংশন ডিকেডস’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিশ্লেষকদের দাবি, মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের কথা বলে স্যাংশন দেয়া হলেও বেশিরভাগ সময় ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের অধ্যাপক সায়ীদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন’ এর ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও অনেক দেশ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকে। যেমন ‘সৌদি আরব’। সেখানে মানবাধিকার বা গণতন্ত্র না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র কখনই তাদের নিষেধাজ্ঞা দেয় নি।

একইভাবে যদি আমরা পাকিস্তানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে দেশটি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সেনা হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত। সেখানেও দীর্ঘদিন গণতন্ত্র নেই। তারপরেও পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দেয় না। উল্টো আমেরিকার গণতন্ত্র সামিটে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পাঠায়।

এখন আমরা নির্দিধায় বলতে পারি, আমেরিকা নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য স্যাংশন দিচ্ছে। এক্ষেত্রে কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র, আবার কোথাও সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৯ হাজার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কিছু খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ওই বছরই বাইডেন প্রশাসন বিশ্বব্যাপী আরও ৭৬৫টি নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরমধ্যে ১৭৩টি ছিল মানবাধিকার ইস্যুতে।

যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে, বৈশ্বিক উৎপাদনে সেই দেশগুলোর অবদান প্রায় এক–পঞ্চমাংশ। এই উৎপাদনের ৮০ ভাগ দাবিদার চীন। কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়েই চীনকে দমাতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ চীনের উপর যতো নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক সেগুলো কোন কাজে আসছে না।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত এক হাজার ৯৪৮টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড ও কানাডা। এপর্যন্ত তারা যথাক্রমে এক হাজার ৭৮২টি এবং এক হাজার ৫৯০টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং তাদের অর্থনীতি অনেক বেশি টেকসই ও মজবুত হয়েছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিলেও সেগুলো শতভাগ কার্যকর করতে পারেনি নিষেধাজ্ঞা দেয়া দেশগুলো। যেসব পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে রাশিয়ায় যাচ্ছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা যারা কার্যকর করবে সেই ইউরোপ নিজেদের স্বার্থে সেটা করছে না। তারা কোনোভাবেই নিজেদের ব্যবসা নষ্ট করতে চাইছে না।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১২টি দেশ, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২২ সালে এসব দেশ রাশিয়ায় কাছে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করেছে। যেগুলোর উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা পণ্য রপ্তানিতে জার্মানি প্রথম এবং লিথুয়ানিয়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইরান ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছিল তিন হাজার ৬১৬টি। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত ও ইসরায়েলের মতো দেশ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বছরের পর এতো নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমেরিকা বা তার মিত্ররা থামাতে পারেনি। একই অবস্থা কিউবা, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও।

মোদ্দা কথা কোন নিষেধাজ্ঞাই এসব দেশের অর্থনীতি ধ্বসিয়ে দিতে পারেনি। বরং বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিকল্প পথের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাশিয়া ও চীন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা ভিসা নীতি নিয়ে আরও সোচ্চার হওয়ার সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের। এখন বাংলাদেশ নিজেদের প্রমাণ করার এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

গণমাধ্যমেও মার্কিন ভিসানীতি: সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের গণমাধ্যমও মার্কিন ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে পারে- পিটার হাসের এমন বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। তারা বলছেন, এটা গণমাধ্যমে ভীতির পরিবেশ তৈরি

করবে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তারা বলছেন, গণমাধ্যম স্বাধীন সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে চলে।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত শুক্রবার ভিসানীতি প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র। তাতে বলা হয়, এই ভিসানীতির আওয়াতায় পড়বেন সরকারি দল, বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এমন ঘোষণার দুই দিনের মাথায় রোববার ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস জানিয়েছেন, এই ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমও আসতে পারে।

পিটার হাসের এমন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিকে নেতা ও গণমাধ্যমকর্মীরা। বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, “প্রশ্ন হলো- গণমাধ্যম সব সময় ন্যায় বিচার, মানবাধিকার, অপশাসন, অন্যায়, অবিচার, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করে। মানুষের ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে। সেখানে বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি হবে। এটা হলে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্থ হবে।” ভয়-ভীতির পরিবেশের মধ্যে কাজ করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, “এটা মেন আমাদের জন্য কাম্য নয়, কেমনি যারা বিধিনিষেধ আরোপ করবে তাদের জন্যও কাম্য নয়। ”

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, “মিডিয়া কীভাবে একটা দেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ করে সেটা আমার বোধগম্য নয়। একটা টিভি চ্যানেলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস মিডিয়া বিষয়ে যা বলেছেন সেটা পরিস্কার নয়। যারা স্বাধীন গণমাধ্যমের কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে- তারা কীভাবে মিডিয়ার বিষয়ে এমন কথা বলে, এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে?” তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন, “ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রতিটি গণমাধ্যম নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিতে চলে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের কল্যাণেই দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্থ বা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেটা দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে।

দীপ আজাদ বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় সে দেশের

গণমাধ্যমগুলো সে দেশের দল বা প্রার্থীকে সমর্থন দেয়। এটা তাদের সম্পাদকীয় নীতি। বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যম যদি গণতন্ত্র ধ্বংস বা ব্যহত করার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে সেটিকে আমরা গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করি না। সেটিকে আমরা সংগঠন বা ব্যক্তির মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করি।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন বলেন, “আমরা মনে করি এটি স্বাধীনতারে উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্য আমাদের সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্থ করবে। স্বাধীন মত প্রকাশের এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা বা হস্তক্ষেপ সাংবাদিকদের ভীত করে তুলবে।”